একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণঃ তার থেকে বাঁচার উপায়

আব্বাস আলী খান

একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়

আব্বাস আলী খান

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ
তার থেকে বাঁচার উপায়
আব্বাস আলী খান

প্রকাশক
মাওলানা আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশ কাল
ডিসেম্বর - ১৯৯৮

৭ম প্রকাশ
জুলাই - ২০০৮
শ্রাবণ - ১৪১৫
রজব - ১৪২৯

মূল্য ঃ নির্ধারিত ১৮.০০ (আঠারো) টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা।

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

প্রকাশকের কথা

ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃত মরহুম আব্বাস আলী খান রচিত "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ : তার থেকে বাঁচার উপায়" বইটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির উত্তরোত্তর চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আবারো প্রকাশিত হলো। বর্তমান সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য দরকার একটি আদর্শবাদী মজবুত সংগঠন বা দল। এ দল এমনিতে গড়ে উঠে না, এ জন্য প্রয়োজন ত্যাগ-তিতিক্ষা, কুরবানী। তেমনি একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদী দলের স্থায়িত্বও নির্ভর করে নেতা-কর্মীদের সাহস, ধৈর্য, দূরদর্শিতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদির উপর।

এসব বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে বইটিতে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি আদর্শবাদী দল। বইটি দলের নেতা কর্মীদের একটি গাইড হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি। বইটি থেকে সংগঠনের জনশক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থকতা লাভ করবে।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

আদর্শবাদী দল

প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করে তার স্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি আদর্শ বেছে নিতে হয়। এর সাথে পৃথক চিন্তাধারাও থাকে। এ চিন্তা ও আদর্শের সাথে যারা সকল দিক দিয়ে একমত পোষণ করে তারা একটি দল গঠন করে। একে বলা হয় একটি আদর্শবাদী দল। এ দল ইসলামী হতে পারে, ইসলাম বিরোধীও হতে পারে।

সমাজ বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের পূর্বে সে আদর্শের ছাঁচে ব্যক্তি গঠন অবশ্যই করতে হয়। এ আদর্শ বাস্তবায়নকে তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য ও মিশন হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার জন্য তারা অকাতরে জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। প্রতিপক্ষের শত নির্যাতন নিষ্পেষণ তাদেরকে কিছুতেই দমিত করতে পারে না। দলের নেতা ও কর্মীদের হতে হয় নির্ভীক, সাহসী ও ধৈর্যশীল। বিশেষ করে নেতাকে হতে হয় গতিশীল, দূরদর্শী, সমসাময়িক সকল সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং চরম সংকট মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। দলের নেতৃত্ব ও নিয়ম শৃঙ্খলার আনুগত্য হবে সকলের জন্য অনিবার্য।

যে কোন আদর্শবাদী দলের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। একটি ইসলামী দলের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী ছাড়াও অতিরিক্ত আরও অনেক গুণাবলীর প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তাদের মধ্যে দেখতে চান।

এ দলের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর তা করতে হলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম করে যেতে হবে। তাই এ দলের একটি ব্যক্তির প্রতিটি কথা ও কাজ এমন হতে হবে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষই হবে তাদের সকল কর্মতৎপরতার দিগ্‌দর্শী। এ দলের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য পরে বর্ণনা করা হবে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি আদর্শবাদী দল। এ দলের সূচনা হয়েছিল অবিভক্ত ভারতে ১৯৪১ সালে।

দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে দল গঠনের পটভূমি রচনা

১৯৩৭ সালে আল্লামা ইকবাল হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবে হিজরত করার জন্যে মাওলানা মওদূদীকে আহ্বান জানান। আল্লামা ইকবাল তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে মাওলানার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি কখনো সাইয়্যেদ নাযীর নিয়াযী এবং কখনো মিয়া মুহাম্মদ শফীকে দিয়ে তরজুমানুল কুরআন পড়াতেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

ঠিক এ সময়ে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত এসডিও চৌধুরী নিয়ায আলী তাঁর ষাট-সত্তর একর জমি ইসলামের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের পাকা ঘর-বাড়ী তৈরি করে বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে দ্বীনের বৃহত্তর খেদমতের অভিলাষী তিনি ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি আল্লামা ইকবালের পরামর্শ চাইলে তিনি একমাত্র মাওলানা মওদূদীকেই এ কাজের জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তি মনে করেন। মাওলানা মওদূদী ড. ইকবালের অনুরোধে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন এবং চিরদিনের জন্যে হায়দারাবাদ পরিত্যাগ করে ১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট নামক স্থানে হিজরত করেন। অতঃপর 'দারুল ইসলাম' নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করে তাঁর মহান কাজের সূচনা করেন।

দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠনের পর মাওলানা তাঁর জিহাদী প্রেরণাদায়ক ভাষণে বলেন ঃ

"এখন সে সময় এসে গেছে যখন আমাদেরকে মুসলমান থাকা না থাকার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে হবে। যদি আমরা মুসলমান থাকতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আমাদের আপন পরিবেশ এবং তারপর গোটা দুনিয়াকে দারুল ইসলাম বানাবার সংকল্প নিয়ে ময়দানে নামতে হবে এবং তার জন্যে দেহমন বিলিয়ে দেয়ার

পুরোপুরি ঝুঁকি নিতে হবে। আমরা যদি এতোটুকু হিম্মৎ ও সাহসিকতা দেখাতে না পারি, তাহলে ইসলাম থেকে চিরদিন দূরে থাকার জন্যে তৈরী থাকা উচিত। কারণ ভারতে ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্রিটিশ শাসনের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করতে যাচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার স্তন্য পানে বিকশিত হচ্ছে, তা আপন প্রচেষ্টায় কায়েম করা অথবা নিস্ক্রিয় থেকে তার প্রতিষ্ঠা বরদাশত্ করার পরিণাম এ হতে পারে যে, মুসলমান এক সর্বব্যাপী সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যাবে যা আকীদাহ্ ও আমল উভয় দিক দিয়ে হবে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী।"

কতিপয় ''উন্মাদের" (দেওয়ানা) প্রয়োজন

এ সময়ে দুর্দান্ত কুফরী শক্তির প্রভূত্ব কর্তৃত্ব দেখার পর যে ব্যক্তি দারুল ইসলাম কায়েমের জন্য ময়দানে নেমে পড়বে সে অবশ্যই 'দেওয়ানা'

(উন্মাদ) এবং আগুন নিয়ে খেলতে চায়। বিশ্বাস করুন, বাজি; প্রায় হেরে গেছি এবং ময়দান হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এ অবস্থায় মুকাবেলার জন্য দাঁড়ানো উন্মাদেরই কাজ। এমন উন্মাদ, যে জেনে-বুঝে আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।

এখনো ভালো করে জেনে বুঝে রাখুন যে, এর পরিণাম হবে প্রকৃত পক্ষে এই যে, যমীন ও আসমানের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু আপনাদের দুশমন হয়ে পড়বে এবং সকল কুফরী শক্তি ও আপনাদের কওমের মুনাফেকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনাদের নিষ্পেষিত করার চেষ্টা করবে। কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে যতোই মতবিরোধ থাকনা কেন, দারুল ইসলাম শব্দটি তাদের নিকটে সমান চ্যালেঞ্জ এবং এ ধ্যান ধারণা তারা কেউই বরদাশত করতে পারে না। এসব ভালো করে জেনে বুঝে আপন মনের পর্যালোচনা করে দেখুন যে, তার মধ্যে মুসলমান থাকার জযবা এ উন্মাদনার পর্যায়ে পৌছেছে কিনা, তারপর দেখুন যে, যে জিনিস প্রকাশ্য অসম্ভব বলে দেখা যাচ্ছে এবং যা লাভ করার চেষ্টায় জান ও মালের বিপুল ক্ষতি সুনিশ্চিত,

তারপরও তা কুরবানী করতে প্রস্তুত কিনা।

যাদের মধ্যে এ উন্মাদনা বিদ্যমান এবং যারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে ব্যর্থতাসহ মৃত্যুবরণ করাকে দুনিয়াবী সাফল্যের উপর অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত আমাদের প্রয়োজন শুধু তাদের এবং তারাই দারুল ইসলাম আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম।

দারুল ইসলামী ট্রাস্ট ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে দল গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে এবং ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মাওলানার কথিত পঁচাত্তর জন 'উন্মাদ'কে নিয়ে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এ জামায়াতের উত্তরসূরী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

এ দলের পরিচয় দিতে গিয়ে এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) বলেন-

"এ দলের সদস্যদেরকে ঈমানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ও অবিচল হতে হবে এবং আমলের দিক দিয়ে হতে হবে প্রশংসনীয় ও উচ্চমানের। কারণ তাদেরকে সভ্যতা সংস্কৃতির ভ্রান্ত ব্যবস্থা ও রাজনীতির বিরুদ্ধে কার্যতঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে এবং এ পথে আর্থিক কুরবানী থেকে শুরু করে কারাদণ্ড এমন কি ফাঁসিরও ঝুঁকি নিতে হতে পারে।"

জামায়াতের কাজ কি?

জামায়াতের কাজ কি - এ সম্পর্কে মওদূদী রহ. বলেন -

"দুনিয়াতে জামায়াতে ইসলামীর জন্য করার যে কাজ রয়েছে, সে সম্পর্কে কোন সীমিত ধারণা পোষণ করবেন না।.... তার কাজের পরিধির মধ্যে রয়েছে পূর্ণ প্রসারতাসহ গোটা মানব জীবন। ইসলাম সকল মানুষের জন্য এবং যেসব বস্তুর সাথে মানুষের সম্পর্ক, ইসলামের সাথেও সে সবের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব ইসলামী আন্দোলন এক সর্বব্যাপী আন্দোলনের নাম।"

"যারা জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করবে তাদের প্রত্যেকের এ কথা ভালো

করে বুঝে নেয়া দরকার যে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যে কাজ রয়েছে তা যেমন তেমন কাজ নয়। দুনিয়ার নীতি নৈতিকতা, রাজনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রতিটি বস্তু পরিবর্তন করে দিতে হবে। খোদাদ্রোহিতার উপর যে ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম রয়েছে তা বদলিয়ে খোদার আনুগত্যের উপর তা কায়েম করতে হবে। এ কাজে সকল শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ও প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে প্রত্যেককে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে সে কোন্ কন্টকময় পথে পা বাড়াচ্ছে।"

এ কথাগুলো তিনি বলেন জামায়াত প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর প্রদত্ত ভাষণে। ভাষণের শেষে তিনি বলেন–

"আমার জন্য ত এ আন্দোলন আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমার জীবন মরণ তারই জন্য। কেউ সম্মুখে অগ্রসর না হলে আমি হবো। কেউ সহযোগিতা না করলে আমি একাকীই এ পথে চলবো। গোটা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধিতা করলে আমি একা তার বিরুদ্ধে লড়তে ভয় করবো না।"

আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্যে যে বিদায়ী ভাষণ দান করেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১। জামায়াত সদস্যদের কুরআন, সীরাতুন্নবী ও সীরাতে সাহাবার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকা একান্ত আবশ্যক। এসব বারবার এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।

২। এ আন্দোলনের প্রাণ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে তায়াল্লুক বিল্লাহ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক)। যদি আল্লাহর সাথে আপনাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়, তাহলে আপনারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং তা সাফল্যের সাথে চালাতে পারবেন না। অতএব নামায ছাড়াও নফল ইবাদতেরও নিয়মিত ব্যবস্থা করুন। নফল নামায, নফল রোযা এবং সদকা এমন সব জিনিস যা মানুষের মধ্যে ইখলাস ও ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করে।

৩। জামায়াতের রুকনদের ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, তারা এক

বিরাট দাবীসহ বিরাট কাজের জন্য ময়দানে নামছেন। যদি তাদের চরিত্র ও আচার আচরণ দাবীর তুলনায় এতোটা হীন হয় যে তা অনুভূত হয়, তাহলে তারা নিজেদেরকে ও তাদের দাবীকে হাস্যকর বানিয়ে দিবেন। এ জন্য এ দলে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে তার দ্বিগুণ দায়িত্ব অনুভব করতে হবে। খোদার সামনে ত অবশ্যই দায়ী থাকতে হবে এবং সেই সাথে খোদার সৃষ্টির সামনেও তার দায়িত্ব বড়ো কঠিন।

৪। যে জনপদেই আপনারা থাকুন, সেখানকার সাধারণ অধিবাসীদের তুলনায় আপনাদের চরিত্র উন্নতমানের হওয়া উচিত। বরঞ্চ চরিত্র, আমানতদারী ও দিয়ানতদারীতে দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে। আপনাদের সামান্য পদস্খলন শুধু জামায়াতের উপরই নয় বরঞ্চ ইসলামের উপর কালিমা আরোপ করবে এবং আপনারা অনেকের গোমরাহির কারণ হয়ে পড়বেন।

৫। জামায়াতের রুকনদের ঐসব কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকা উচিত যা মুসলমানদের মধ্যে ফির্‌কা সৃষ্টি করে।

(ক) নিজেদের নামায সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথকভাবে পড়বেন না।

(খ) নামাযে নিজেদের জামায়াত পৃথক করবেন না।

(গ) কোন বিতর্কে লিপ্ত হবেন না।

এভাবে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪১ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহে এ আদর্শবাদী দলটি তার যাত্রা শুরু করে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এ দলটি অবিচ্ছিন্নভাবে তার আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে চলেছে। এ দলটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস অবশ্যই পাঠ করা দরকার।

আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়

এ ধরনের একটি আদর্শবাদী দলের বিকৃতি ও পতন হতে পারে কিনা এবং হলে কিভাবে হতে পারে তাই আলোচ্য বিষয়। একটি দলের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের যেমন কতকগুলো কারণ থাকে, তেমনি তার বিকৃতি ও পতনের অবশ্যই কিছু কারণ থাকবে। কোন দলই চায় না যে তার বিকৃতি ও পতন ঘটুক। সে জন্য যেসব কারণে বিকৃতি ও পতন ঘটতে পারে বলে মনে করা হয় তা ভালো করে জেনে নিয়ে পূর্বাহ্নেই তার প্রতিরোধ করতে পারলে বিকৃতি ও পতন থেকে দলকে রক্ষা করা যায়।

বিকৃতি ও পতনের কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করা।

এ দলের তথা ইসলামী আন্দোলনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা যদি কেউ পুরোপুরি তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিতে না পারে, জামায়াতকে সঠিকভাবে না বুঝে কেউ যদি নিছক আবেগের বশীভূত হয়ে জামায়াতে যোগদান করে, অথবা এরূপ ধারণা নিয়ে যে, জানমালের কুরবানী না করে শুধু জামায়াতভুক্ত হলেই নাজাত পাওয়া যাবে, তাহলে এসব লোক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তাদের দ্বারা জামায়াতের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এ ধরনের মানসিকতা বেশী ছড়িয়ে পড়লে জামায়াতের বিকৃতি ও পতনের পথ খুলে যায়। জীবনের সকল প্রকার কাজকর্মের উপরে আন্দোলনের কাজকে অগ্রাধিকার না দিয়ে

ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা বৈষয়িক স্বার্থকে আন্দোলনের উপর অগ্রাধিকার দিলে আন্দোলনের প্রাণশক্তি বিনষ্ট হয় এবং তার পতন রোধ করা সুকঠিন হয়ে পড়ে।

২। কুরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন না করা।

ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র। তার জন্য নিয়মিত কুরআন, বিশেষ করে তাফহীমুল কুরআন টীকাসহ, হাদীস, সীরাতুন্নবী, সীরাতে সাহাবা, ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাস দৈনিক নিয়মিত পাঠ করা দরকার। সেই সাথে সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে। এসব অধ্যয়নের ফলে শুধু জ্ঞান লাভ করাই যাবে না, নিজের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা চির জাগ্রত রাখা যাবে। এ অধ্যয়ন বা পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেলে নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মবিমুখতা দেখা দিবে যা হবে বিকৃতির অন্যতম কারণ।

৩। সময় ও আর্থিক কুরবানীর প্রতি অবহেলা।

ইসলামী আন্দোলন অধিক সময় ও বেশী বেশী আর্থিক কুরবানী দাবী করে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর। এ কুরবানী যদি না থাকে অথবা কুরবানীর প্রেরণা কমতে থাকে, তাহলে আন্দোলনের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। এ কুরবানী বন্ধ হয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়।

৪। দলীয় মূলনীতি মেনে না চলা।

একটি আদর্শবাদী দলের অবশ্যই কিছু মূলনীতি থাকে যা দলের সদস্যদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এ মূলনীতি লঙ্ঘিত হতে

থাকলে দলের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এবং তার বিকৃতি শুরু হয়ে যায়। কোথাও মূলনীতি লংঘিত হয়েছে বলে যদি জানা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তা বন্ধ করতে হবে।

৫। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করা।

একত্রে বহু লোক বসবাস করতে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। তার ফলে একজন আরেকজনের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারে। এমন অবস্থায় ইসলামের নীতি হলো উভয়ের বক্তব্য শুনার পর ইনসাফপূর্ণ বিচার, ফয়সালা করে দেয়া। একটি ইসলামী দলের জনশক্তির মধ্যেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া এ দলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়ে। স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব অথবা আঞ্চলিকতার কারণে ইনসাফ করতে ব্যর্থ হলে দলের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায় এবং পতনের পথ খুলে যায়।

৬। ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব।

একটি ইসলামী আদর্শবাদী দলের বৈশিষ্ট্য এই যে, দলের সদস্যগণ ইসলামের গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং এভাবে তারা হবে সীসাঢালা একটা প্রাচীরের মতো, যাতে করে বাতিল শক্তির মুকাবেলা করতে পারে। এ ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলে অথবা তা শিথিল হলে দলের প্রাসাদও ভেঙ্গে পড়তে পারে।

৭। নিম্নলিখিত কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় ঃ

(ক) পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ;

(খ) গীবত, পরনিন্দা পরচর্চা;

(গ) পরশ্রীকাতরতা;

(ঘ) একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখা;

(ঙ) কারো বিপদে আপদে তার খোঁজ-খবর না নেয়া;

(চ) পরস্পর বৈষয়িক স্বার্থে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া;

(ছ) অযথা কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করা।

কুরআন ও হাদীসে এসব আচরণের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে। এসব কারণে শুধু একটি দলই নয়, বরঞ্চ মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিও নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

৮। নিম্ন লিখিত কারণে একটি ইসলামী দল তার প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে ফেলে এবং নিষ্ক্রিয় ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে ঃ

(ক) কৃত শপথ পূরণ না করা। আল্লাহর সাথে করা শপথ এবং মানুষের সাথে করা শপথ। বিশেষ করে যে শপথ গ্রহণ করে জামায়াতে প্রবেশ করা হয়। শপথ ভঙ্গ করলে কথা ও কাজের কোন মিল থাকে না। এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা হয়। এর পরিণাম খুবই মারাত্মক বলে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াদা ভঙ্গকারীকে দীন বহির্ভূতও বলা হয়েছে।

(খ) নিয়মিত দাওয়াতী কাজ না করা। দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী বেশী লোককে ইসলামী দলভুক্ত করা। যত বেশী সংখ্যক লোক ইসলামী দলভুক্ত হবে, ইসলামের স্বপক্ষে ততো বেশী জনমত সৃষ্টি হবে। ইসলামের স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি না হলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা কি করে হবে? দাওয়াতী কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে না থাকলে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং অনেকে জামায়াত থেকে কেটে পড়ে।

(গ) মাসিক সাহায্য নিয়মিত না দেয়া। জান ও মালের কুরবানীর শপথ

করে ইসলামী দলে শামিল হয়ে সে কুরবানী না করলে দল চলবে কি করে?

(ঘ) জামায়াতের ডাকে সকল ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক কাজ পরিহার করে নির্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে হাজির না হওয়া। একটি দলকে আদর্শবাদী ও বিপ্লবী দল তখনই বলা হবে, যখন দলের নেতার পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট স্থানে যথা সময়ে হাজির হবেন। এভাবে তাঁদের আদর্শিক ও নৈতিক মান প্রমাণিত হওয়ার পর আর কিছু করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। তাঁদেরকে বলা হবেঃ "আপনারা নেতার ডাকে যথাসময়ে সাড়া দিয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এমন দলের দ্বারাই বিপ্লব সম্ভব। এখন আপনারা স্ব স্ব স্থানে ফিরে যেতে পারেন।"

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) একটি সম্মেলনে ঠিক এরূপ কথাই বলেছিলেন।

(ঙ) প্রতি মুহূর্তে খোদার ভয় এবং আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি মনের মধ্যে জাগ্রত না থাকা। এ অনুভূতি বিলুপ্ত হলে মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন সম্ভব নয়।

৯। জনশক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হওয়া।

দলের জনশক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হলে তা বিকৃতি ও পতনের কারণ হয়। এ হতাশার কারণও নির্ণয় করা দরকার। ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও পরিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তার অভাবে এ হতাশার সৃষ্টি হয়। জনশক্তির মধ্যে যদি এ চিন্তার প্রাবল্য দেখা যায় যে, এতকাল যাবত আন্দোলন করা হচ্ছে, বিজয়ের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকার গঠন ত দূরের কথা, সংসদেও বেশী আসন পাওয়া যাচ্ছে না। দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাচ্ছে না। জামায়াতের নীতি নির্ধারণে অবশ্যই কিছু ভুল হয়ে থাকবে। তা

সংশোধন করা দরকার। এসব চিন্তার দ্বারা পরোক্ষভাবে নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করাই হয়ে থাকে। এ জামায়াতের পতনেরই পূর্বাভাস।

এ ধরনের চিন্তা যারা করেন তাদের নিকটে জয় পরাজয়ের মানদণ্ড কি? তাদের ধারণা একটানা সংগ্রাম ও চেষ্টা চরিত্রের সুফল যদি অবিলম্বে অথবা এ জীবনে পাওয়া না যায় তাহলে তা আলবৎ পরাজয়, এ একেবারে বস্তুবাদী চিন্তা প্রসূত।

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মওদূদী জামায়াত গঠনের পূর্বে ন'বছর যাবত ইসলামকে তার সত্যিকার রূপ ও আকৃতিতে পেশ করেন এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদী মতবাদ ও চিন্তাধারার পরিবর্তে ইসলামী চিন্তা চেতনা সৃষ্টির কাজ করেন। এসব তিনি করছিলেন তাঁর মাসিক পত্রিকা তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে সে সময়ে তিনি তাঁর পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে মূল্যবান কথা বলেন, তার গুরুত্ব বিবেচনা করে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"মুসলমান জাতির অবস্থা বর্তমানে এক অনুর্বর ভূমিখণ্ডের মতো হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের বৃক্ষাদি খুব বাড়ে ও ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধরনের বৃক্ষ বর্ধিত ও বিকশিত হতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে বহু কল্যাণ ও সংস্কারের বীজ ত জমিতেই বিনষ্ট হয়ে গেল। কোনটি অঙ্কুরিত হলেও তার মূল বিস্তার লাভ করতে পারেনি।"

"এ অবস্থা সম্পর্কে আমি স্বয়ং অবহিত ছিলাম। যখন আমি এ কাজ শুরু করি তখন আমার শুভাকাঙ্খীগণ আমাকে এই বলে নসিহত করেন, 'অনুর্বর জমিতে বীজ ফেলে নষ্ট করোনা'। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে মর্দে মুমিনের এ কাজ নয় যে, জমির দুরবস্থা, মওসুমের অনুপযোগিতা ও পানির স্বল্পতা দেখে সে হিম্মত হারিয়ে ফেলবে। এ জন্যে অনাদিকাল থেকে তার এ ভাগ্যই লিখে রাখা হয়েছে যে, সে অনুর্বর জমিতে হাল চালাবে, তার অনুর্বরতা ও চাষের অনুপযোগিতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আপন গায়ের ঘাম দিয়ে এবং সম্ভব হলে তাজা খুন দিয়ে তাকে সিক্ত করতে হবে এবং ফলাফলের পরোয়া না করে বীজ বপন করতে হবে।

> যদি জমি তার প্রচেষ্টায় সিক্ত ও উর্বর হয়, তাহলে সাফল্য ত নিশ্চিত। কিন্তু সে যদি এ অনুৎপাদনশীল জমিতে সারা জীবন নিষ্ফল পরিশ্রম করতে থাকে এবং অবশেষে একদিন এ কাজেই জীবন দিয়ে দেয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে সে বিফলকাম নয়। তার জন্য এ সাফল্য কি কম যে, যে কাজ সে ফরয মনে করতো তার জন্য সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল ছিল এবং ব্যর্থতা তাকে তার কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখতে পারেনি? (তরজুমানুল কুরআন, মহররম, ১৯৩৬ ইং)

নিষ্ফল পরিশ্রমের পরও যদি হতাশ না হয়ে সে তার কর্তব্যকর্মে অবিচল থাকে। তাহলেও তার পূর্ণ পুরস্কার আখিরাতে দেয়া হবে।

মাওলানা আরও বলেন–

> "প্রত্যেক সত্যানুসন্ধী ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, সে যেন তার মধ্যে 'ইকামতে দ্বীনের' তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।..... এ চেষ্টা চরিত্রের পরিনাম কি হবে তা আলোচনা বহির্ভূত। এমনও হতে পারে যে, মাটির উপর দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হবে, জ্বলন্ত কয়লার উপর নিক্ষিপ্ত করা হবে এবং আমাদের মৃতদেহ কাক চিলের খাদ্য হবে। কিন্তু এ ব্যর্থতা কোন ব্যর্থতা নয়। ব্যর্থতার কোন আশঙ্কা অথবা নিশ্চয়তা আমাদেরকে সে দাবী থেকে মুক্তি দান করবে না যা আমাদেরকে যে কোন মূল্যে, যে কোন অবস্থায় পালন করতে হবে।"

(জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ৩য় খণ্ড)

আসলে আমাদের দায়িত্ব হবে ইসলামী বিপ্লবের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম করা, বিপ্লব করে দেখানো নয়, সংগ্রাম করতে গিয়ে যদি আমরা আদর্শিক দিক দিয়ে ভুল করি, তাহলে তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে দায়ী হতে হবে। আজীবন সঠিকভাবে জান ও মালের কুরবানীসহ সংগ্রাম করার পরই ত সুফল লাভ করার প্রশ্ন আসে। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়ার জীবনেও সাফল্যের স্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিজের জীবনেই যারা সুফল না দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়, তাদের চিন্তা ত্রুটিপূর্ণ। এ ধরনের চিন্তা ও হতাশা দলের বিকৃতি ও পতন ডেকে আনে।

১০। নেতৃত্বের অভিলাষ।

ইসলামী আন্দোলনে তথা দলে যোগদান করতে হবে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে, নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। নেতৃত্বের অভিলাষ পোষণ করে যোগদান করলে তা করা হয় ব্যক্তি স্বার্থের জন্য। এরপর দীনের কোন খেদমত সম্ভব নয়। তাই কোন পদপ্রার্থী হওয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ। জামায়াতের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারে না। প্রার্থী হওয়ার প্রবণতা যদি কারো মধ্যে দেখা যায় এবং নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য আকারে ইঙ্গিতে কিছু চেষ্টা তদবীর করে অথবা তার পক্ষে গোপন প্রচারণা চালানো হয় তাহলে তাকে নেতৃত্বের অযোগ্যই মনে করা হয়। এ প্রবণতা অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারলে চরম সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা জামায়াতের বিকৃতির পথ খুলে দেয়।

১১। অর্থ-সম্পদের প্রতি লালসা।

বস্তুবাদী মানসিকতা বা অর্থের লালসা একটি ইসলামী দলের জন্য মারাত্মক। অর্থের লালসা মানুষকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত করে। বিশেষ করে আন্দোলনের দায়িত্বশীল বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ করলে সে যেন আন্দোলনের বুকেই ছুরিকাঘাত করলো।

অর্থলিপ্সা আত্মসাৎ, ছাড়াও মানুষকে নানান অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করে। তখন তার মধ্যে আর খোদাভীতি ও আখেরাতে জবাবদিহির কোন অনুভূতি বিদ্যমান থাকেনা। আমানতের জন্য আখেরাতে জবাবদিহি এবং খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকলে আমানত খেয়ানত সম্ভব নয়। একটি ইসলামী দলে খেয়ানত শুরু হলে সে

দল আর টিকে থাকতে পারে না। সে জন্যে প্রত্যেক মাসের বাইতুল মালের হিসাব মাসিক বৈঠকে পেশ করা উচিত।

১২। জীবনমান উন্নত করার প্রবণতা।

জীবনমান উন্নত করার প্রবণতা ইসলামী জামায়াতের আদর্শের পরিপন্থী। জীবনের মান (Standard) বাড়াতে হলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হয় এবং এর লক্ষ্য হয় আখেরাত বা খোদামূখী না হয়ে দুনিয়ামূখী হওয়া। ইসলামী আন্দোলনের পথে এ সবচেয়ে বড়ো বাধা।

১৩। সহজ সরল জীবন যাপন না করা।

সহজ সরল ও সাদা মাটা-জীবন যাপনের পরিবর্তে বিলাসী জীবন যাপন সংগ্রামী জীবনের সাথে সাংঘর্ষিক। সে জন্য তা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তার অর্থ এ নয় যে, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ছিন্ন ও তালি দেয়া পোশাক পরিধান করতে হবে এবং অতি নিম্নমানের আহার করতে হবে। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। প্রথম যুগের ইসলামী মনীষীগণ দৃষ্টান্তমূলক সহজ সরল জীবন যাপন করতেন।

দেখা যায়, ভাগ্যক্রমে কোন দরিদ্রের সন্তান সরকারী চাকুরী পেলে অথবা সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে তার জীবনের মান হঠাৎ বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে বিভিন্ন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ইসলামী আন্দোলনের কোন সদস্য এ ধরণের সুযোগ পেলে তার নিজেকে ইসলামের মডেল হিসেবে পেশ করা উচিত। বর্তমান যুগেও এটা যে সম্ভব তা মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এ রাজ্যে 'পাস' নামের ইসলামী দল কিছুকাল যাবত সরকার পরিচালনা করে আসছে।

কেলান্তান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিক আবদুল আজিজ একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সরকার থেকে নির্ধারিত রাজকীয় ভবন আছে। সেখানে অবস্থান না করে তিনি তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে বাস করেন যা খুব নিম্ন মানের এবং সেকেলে। তাঁর সিকিউরিটির কোন ব্যাবস্থা নেই এবং কোন প্রটকলও মেনে চলা হয় না। ড্রইংরুমে কোন কার্পেট ও সোফাসেট নেই। '৯১-এর আগষ্ট মাসে এখানে তার সংগে মিলিত হয়েছিলাম। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যা বেতন পান তার শতকরা ষাটভাগ রাজ্যের রাজস্বখাতে জমা দেন। বিশভাগ ইসলামী দলের বাইতুলমালে দান করেন এবং বিশভাগ নিজের জন্য ব্যয় করেন। মুখ্যমন্ত্রীর রাজকীয় ভবনে তিনি না থাকলেও আমাদের মতো মেহমানকে সেখানে থাকতে দেয়া হয়। তাঁর আচরণ ও জীবন যাপন খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ নিজেদেরকে এমন ক্ষেত্রে ইসলামের মডেল হিসেবে পেশ করতে না পারলে আন্দোলনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

১৪। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ হচ্ছে 'তায়াল্লুক বিল্লাহ' আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। যে কাজ করতে গিয়ে পদে পদে জীবনের ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় হলো তাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা। প্রভূ হিসেবে তাঁকে স্মরণ এবং বান্দাহ হিসেবে তার হুকুম পালন। তাঁকে স্মরণ করার, স্মরণ রাখার এবং সম্পর্ক গভীর করার সর্বোত্তম উপায় নামায। সে নামায সত্যিকার নামায হতে হবে। আল্লাহর মনঃপূত হতে হবে। নামাযী প্রত্যেক রাকায়াতে ছয়বার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে 'আল্লাহু আকবর' আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। একথা যদি নামাযীর অন্তরের কথা হয় অবশ্যই তা অন্তরের কথাই হতে হবে, তাহলে

সবচেয়ে বড় সবচেয়ে শক্তিশালী যে মহান সত্তা তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিও নিবিড় হলে সে তাঁর প্রিয় বান্দার মধ্যে গণ্য হবে এবং আল্লাহ তাকে ডেকে বলবেন, "আমার প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং তারপর জান্নাতে প্রবেশ কর।"

কারো নামায নামাযের মত না হলে সে ইসলামী আন্দোলনে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবেনা। ইসলামী আন্দোলনকে বিকৃতির পথ থেকে রক্ষা করতে হলে নামায সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর 'হেদায়াত' বইখানা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক ব্যক্তির নামায সঠিক হলে তার যাবতীয় আচরণ সঠিক হবে। তাকে জানতে হবে নবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ কিভাবে নামায পড়তেন।

একজন মুসলমানকে সকল ইবাদতের মধ্যে নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরই নামায ফরয হয়ে যায়। মক্কী জীবনের সূচনাতেই নামায ফরয করা হয়।

যদি কেউ এমন কথা বলেন যে নামায ফরয হয়েছে মক্কী জীবনের শেষে। এখন সকল ফরযের বড়ো ফরয ইকামতে দীন, তাহলে একটা ভ্রান্ত ধারণা পেশ করা হবে এবং নামাযের গুরুত্ব খুবই খর্ব করা হবে। অথচ আখিরাতে সর্ব প্রথম পরীক্ষা নামাযের নেয়া হবে।

তাফহীমুল কুরআন ও সীরাতে সরওয়ারে আলম পড়লে উপরোক্ত ভুল ধারণা দূর হবে। তাফহীমুল কুরআন সূরা দাহরের ২৫-২৬ আয়াতের অর্থ ও টীকা দ্রষ্টব্য।

সীরাতে সরওয়ারে আলমের (দ্বিতীয় খন্ড) ১৪৩ পৃষ্ঠায় 'নবুয়তের পর প্রথম ফরয নামায শিরোনামে' বলা হয়েছে ঃ তাবারী বলেন,

'ইসলামী শরিয়তে প্রথম যে জিনিস ফরয করা হয় তা নামায। ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে হযরত আয়েশার (রা.) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, সর্ব প্রথম রাসূলের (স.) প্রতি যে জিনিস ফরয করা হয় তা নামায। ইবনে

ইসহাকের মতে এক সময়ে হুজুর (স.) মক্কার উচ্চ অংশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রিল (আ.) অতি সুন্দর আকৃতিতে এবং সুবাসিত দেহে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করেন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়ে একথা বলেছেন আপনি জ্বীন ও মানুষের প্রতি আমার রাসূল। এ জন্য আপনি তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর দাওয়াত দিন।"

তারপর হযরত জিব্রিল মাটিতে পায়ের আঘাত করলে এক ফোয়ারা সৃষ্টি হয়। তিনি অযু করেন যাতে হুজুর (স.) নামাযের জন্য পাক হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারেন। তিনি বলেন, আপনি অযু করুন। তারপর জিব্রিল রসূলের (স.) সঙ্গে চার সিজদার সাথে দু'রাকায়াত নামাজ পড়েন।

তারপর রসূল (স.) হযরত খাদিজাকে (রা.) ওখানে নিয়ে আসেন। অযু করান এবং দু'রাকায়াত নামায তাঁর সাথে পড়েন। ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরও এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী (আওসাতে) উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারেসা (রা.) থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, রসূলের (স.) উপর অহী নাযিল হওয়ার পর প্রথম কাজ এ হলো যে জিব্রিল (আ.) তাঁকে অযু করার নিয়ম শিক্ষা দেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং রসূলকে (স.) বলেন, আমার সাথে নামায পড়ুন। তারপর রসূল (স.) বাড়ি এসে হযরত খাদিজার (রা.) নিকট সে ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি আনন্দে অধীর হন। তারপর রসূল (স.) তাঁকে সেভাবেই অযু করতে বলেন এবং তাঁর সাথে সেভাবেই নামায পড়তে বলেন যেভাবে তিনি জিব্রিলের সাথে পড়েন। অতএব এ ছিল প্রথম ফরয যা ইকরা' নাযিল হওয়ার পর নির্ধারণ করা হয়।

ইকামতে দীনের সংগ্রাম অবশ্যই ঈমানের দাবী। এ কাজের জন্য যে মন মানসিকতার, যে চরিত্র ও গুণাবলীর প্রয়োজন, তা নামায নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি করে। তার জন্য নামায সত্যিকার নামাযের মতো হতে হবে। নামাযের যাবতীয়

মাসলা-মাসায়েল নামাযীকে জেনে নিতে হবে। নামাযে সূরা ফাতিহাসহ কুরআন পাকের যে আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তার উচ্চারণ শুদ্ধ হতে হবে।

নামায যদি সঠিকভাবে যথাসময়ে জামায়াতের সাথে পড়া না হয়, একাগ্রতা ও বিনয় নম্রতাসহ পড়া না হয়, বরঞ্চ তাড়াহুড়া করে পড়া হয়, সকলের পেছনে মসজিদে প্রবেশ এবং সকলের আগে বেরিয়ে আসা হয়, তাহলে একটি ইসলামী দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং সাধারণ মুসলমান দলটিকে একটি দীনি দল বা জামায়াত হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে। পরিপূর্ণ একাগ্রতাসহ ধীরে ধীরে থেমে থেমে তা'দীলে আরকান সহ নামায পড়তে হবে। রুকু-সিজদাও তেমনভাবে করতে হবে। তাড়াহুড়া করে নামায পড়লে তা'ত নামাযের মতো হবে না। পোশাক পরিচ্ছদও এমন হওয়া দরকার যাতে পরহেজগারীর ছাপ থাকে। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেকটাই পরিধান করে জনসমক্ষে যাওয়া অথবা জনসভায় ভাষণ দেয়া সম্পর্কে জায়েজ নাজায়েজ বিতর্কে না গিয়ে এতোটুকু বলা যায় যে এতে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা এ ধারণাই দিয়েছেন।

নামায প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, তাহাজ্জুদ নামায ফরয করা না হলেও আল্লাহর সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক মজবুত করা তাহাজ্জুদ ব্যতীত সম্ভব নয়। সকল যুগেই আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ নিয়মিত তাহাজ্জুদের অভ্যাস করেছেন। তাঁদের প্রতি আল্লাহর মদদও নেমে এসেছে। রাতের শেষ প্রহরে নরম-গরম ও সুখকর শয্যা ত্যাগ করে খোদার দুয়ারে ধর্ণা দিতে যারা চায়না, তারা ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে জান ও মালের কুরবানী দিবে কি করে?

কুরআন পাকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ আমল করে, কুরআন তাদেরকে 'মুহসীন' এবং 'মুত্তাকী' নামে অভিহিত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত এবং আখেরাতে চিরন্তন সুখ-শান্তির অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছে।

আল কুরআনে বলা হয়েছে -

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ۔ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ- وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يُسْتَغْفِرُوْنَ-

নিশ্চয়ই মুত্তাকীলোক বাগবাগিচার এবং ঝর্ণার আনন্দ ভোগ করতে থাকবে এবং যে যে নিয়ামত তাদের প্রভূ তাদেরকে দিতে থাকবেন, সেগুলো তারা গ্রহণ করবে। কারণ নিঃসন্দেহে তারা এর পূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) মুহসীনীন (বড়ো নেককার) ছিল। তারা রাতের খুব কম অংশই ঘুমাতো এবং শেষরাতে ইস্তেগফার করতো। (কেঁদে কেঁদে আল্লাহর মাগফেরাত চাইতো)- (আয্ যারিয়াত : ১৬-১৮)

এসব লোকদেরকে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাহ বলেছেন এবং নেকী ও ঈমানদারীর সাক্ষ্য দিয়েছেন (সুবহানাল্লাহ)।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ .... وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا -

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ তারা ----- যারা তাদের রবের দরবারে সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকে রাত কাটিয়ে দেয়। (আল ফুরকান : ৬৩-৬৪)

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۔

এসব অগ্নিপরীক্ষায় অটল (ধৈর্যশীল), সত্যের অনুসারী, পরম অনুগত, আল্লাহর পথে মাল উৎসর্গকারী এবং রাতের শেষপ্রহরে আল্লাহর কাছে ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। (আলে ইমরান : ১৭)

তাহাজ্জুদের ফযিলত সম্পর্কে বহু কথা হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) বলেন, হুযুর (স.) যখন মদীনায় তশরিফ আনেন, তখন প্রথম

যে কথাগুলো তাঁর পাক যবান থেকে শুনি তাহলো ঃ

হে লোকগণ! ইসলামের তবলিগ কর, মানুষকে আহার দান কর, আত্মীয়তা অটুট রাখ, আর যখন মানুষ (রাতে) ঘুমিয়ে থাকবে তখন তোমরা রাতে নামায পড়তে থাকবে। তাহলে তোমরা নিরাপদে বেহেশতে যাবে। (হাকেম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন ঃ

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়মিত ব্যবস্থা কর। এ হচ্ছে নেক লোকের স্বভাব। এ তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, গুনাহগুলো মিটিয়ে দেবে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং শরীর থেকে রোগ দূর করবে।

আর এক সময় হুযুর (স.) বলেন

ফরয নামাযগুলোর পরে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামায হলো রাতে পড়া তাহাজ্জুদ নামায। (মুসলিম, আহমদ)

এমনি আরও অনেক নফল নামায ও রোযার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায়, রসূল (স.) এসব পালন করেছেন এবং পালনের জন্যে উৎসাহিত করেছেন।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ -

যে রমযানের রোযা রাখলো এবং তারপর শাওয়ালের ছয়টি (রোযা) রাখলো, তা এ গোটা সময়কালের রোযার সমান। (মুসলিম)

رَكْعَتَا الضُّحٰى خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

চাশতের দু'রাকায়াত নামায দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সব কিছু থেকে উৎকৃষ্ট। (মুসলিম)

১৫। অতিরিক্ত যিকির আযকার।

কিছু লোক আছেন যারা ইসলামের পাঁচ রুকনের সাথে কিছু যিকির আযকার করাকেই ইসলাম মনে করেন। এটা যেমন ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত

তেমনি যিকির আযকার একেবারে পরিহার করাও সঠিক নয়। যেসব মসনুন যিকির আযকার নবী পাকের হাদীস থেকে প্রমাণিত তা অবহেলা করা যায় না। তাও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়াতে সহায়ক হয়।

১৬। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ইসলামী আন্দোলনের পরম লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। এ সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা স্তিমিত হলে আন্দোলনের পতন ত্বরান্বিত করবে কারণ এতে আন্দোলন একটি আত্মাহীন দেহে পরিণত হয়। অতএব এ প্রেরণা অক্ষুন্ন রাখাই যথেষ্ট হবেনা বরঞ্চ ক্রমশ তা বাড়াতে হবে। প্রতিটি কথা ও কাজ, সকল তৎপরতা, চলাফেরা, অপরের সাথে বন্ধুত্ব বা বৈরীভাব পোষণ, লেনদেন, জীবিকা অর্জন আন্দোলনের সকল কাজকর্ম একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং এর প্রেরণা কিভাবে বর্ধিত করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে কাতর কণ্ঠে খোদার মদদ চাওয়া। খোদার সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা যদি দুনিয়া প্রীতিতে পরিবর্তিত হয় তাহলে আন্দোলনের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৭। আত্মসমালোচনা।

আত্মসমালোচনা (মুহাসাবায়ে নফস) ও সামষ্টিক সমালোচনা একটি আদর্শবাদী দলকে বিকৃতি ও পতন থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

অবশ্য অপরের সমালোচনা করার বা সংশোধনের জন্য ভুল ধরিয়ে দেয়ার ইসলামী নীতি পদ্ধতি আছে। সে নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী সমালোচনা করতে হবে। সমালোচনার নিয়তও পবিত্র হতে হবে। উদ্দেশ্য সমালোচিত ব্যক্তিকে হেয় ও অপমানিত করা নয়, বরঞ্চ তার ভুল শুধরিয়ে দিয়ে খোদার পথে চলতে সাহায্য করা। অর্থাৎ ইসলামী নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী এবং সৎ নিয়তে যদি করা না হয় তাহলে ব্যক্তি চরিত্রে বিকৃতি শুরু হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

শয়তান সর্বদা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার পেছনে লেগে থাকে। সে শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে বিপথগামী হচ্ছে কিনা তার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত আত্মসমালোচনা করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে তার মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়লে,

সংগে সংগে তওবা করে সে ত্রুটি সংশোধন করা উচিত। অনেক সময় নিজের ভুল-ত্রুটি নিজে ধরা যায় না। এ জন্য অন্য কোন দ্বীনি ভাইকে ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা উচিত।

১৮। ক্রোধ দমন করা।

ক্রোধ দমন করতে না পারলে সংগঠনে তা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। কারো কোন আচরণে ক্রোধের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাকওয়ার দাবী হচ্ছে তা প্রকাশ না করে দমিত করে রাখা। ক্রোধ দমন করতে না পারলে মুখ দিয়ে কিছু অশালীন কথা, গালি অথবা রূঢ় কথা বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে সম্পর্কের অবনতি হয়, মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং যার প্রতি রাগ প্রকাশ করা হয় সে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ তালাশ করতে থাকে। ইসলামী জামায়াতের জন্য এ আচরণ অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কুরআন পাকে বলা হয়েছে, -

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

খোদাভীরু লোকদের গুণ এই যে, তারা ক্রোধ হজম করে এবং অন্যের (সহকর্মীদের) অপরাধ মাফ করে দেয়। এসব নেককার লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

সহকর্মীদের প্রতি রাগ ও রূঢ় আচরণ করলে তারা দূরে সরে যায় এবং এভাবে সংগঠনে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ-

"হে নবী! এটি আল্লাহর বড়ো অনুগ্রহ যে তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের হয়েছ। নতুবা তুমি যদি উগ্রস্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে তাহলে এসব লোক (সাহাবীগণ) তোমার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব তাদের দোষক্রটি অপরাধ মাফ করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর এবং দীনি আন্দোলনের কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর"। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের কাজ হবে লোকের মন জয় করা, কাছে টানা, দূরে ঠেলে দেয়া নয়। এমন করতে ব্যর্থ হলে দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের এবং বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীলদের নম্র, ভদ্র, উদার, ক্ষমাশীল না হলে তা আন্দোলনের জন্য ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করে। এটাকেই নৈতিক বিকৃতি বলা যেতে পারে।

১৯। মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ।

কোন একটি দলে নীতিগত প্রশ্নে ঐক্যের অভাব হলে এবং তা দূর করতে না পারলে সে ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু মৌলিক প্রশ্নে সকলে একমত না হলে কোন দলই গঠন করা যায় না। একটি সিকিউলার, ইসলাম বিরোধী অথবা অনৈসলামী দলেও মতানৈক্য দেখা যায়। সে অনৈক্যের পেছনে থাকে ব্যক্তি স্বার্থ।

কিন্তু একটি ইসলামী দলের আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক দিক এমন স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্টের অধিকারী যে সেখানে মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্যের কোন কারণ না থাকারই কথা। কারণ এখানে কারো ব্যক্তি স্বার্থের কোন প্রশ্নই থাকতে পারেনা। এ দলের চিন্তা চেতনা ও আবেগ অনুভূতির একমাত্র উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। একই উৎস থেকে নিঃসৃত চিন্তা চেতনার মধ্যে সাদৃশ্য ও ঐক্য হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি সাময়িকভাবে মতপার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আমাদের উচিত চিন্তার ঐক্যের জন্য পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন এবং ঐক্যের মূল উৎসের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। তা না হলে অনৈক্যের আঘাতে একটি দল ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ হয়ে যায়।

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা যে সঠিক ইসলামী চিন্তাধারণা পরিবেশন করেন যার ফসল উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলন, সে চিন্তাধারার সাথে একাত্ম হতে হলে তিরিশের দশকে লেখা তাঁর মাসিক তর্জুমানুল কুরআন বারবার মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। তাঁর রাসায়েল মাসায়েলও পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য ইসলামী আন্দোলন সঠিকভাবে বুঝতে হলে ও তার প্রাণশক্তি লাভ করতে হলে তাফহীমুল কুরআনের বিকল্প কোন তাফসীর নেই। তাফহীম তার টীকাসহ অবশ্যই পড়তে হবে। মাওলানার উপরোক্ত গ্রন্থাবলী বারবার না পড়ার কারণে চিন্তার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়, যা হয় চিন্তার অনৈক্যের কারণ।

২০। বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।

ইসলাম বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হলে ইসলামী দলের বিকৃতি শুরু হয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হলে ইসলামী দলের বিকৃতি শুরু হয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত করা, প্রভাবিত হওয়া নয়, স্রোতে ভেসে যাওয়া নয়, বরঞ্চ আপন স্থানে অবিচল থেকে স্রোতের বিপরীত দিকে চলার চেষ্টা করা।

বর্তমানে সর্বত্র যে ইসলাম বিরোধী পরিবেশ বিদ্যমান, তার দ্বারা প্রভাবিত হলে ইসলামের পথে অবিচল থাকা সুকঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিবেশ মানুষের মনমস্তিষ্কে, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ জাহেলিয়াতের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলে চিন্তার অঙ্গনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এমন সব চিন্তার উন্মেষ হয় যা ইসলামী চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। অতঃপর কথা বার্তায়, আচার-আচরণে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, মিটিং মিছিলে ও শ্লোগানে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ভাষণ দিতে গিয়ে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়। অথবা প্রতিপক্ষের প্রতি ইট পাটকেল বা বোমা নিক্ষেপ করা হয় অথবা আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করা হয়। তখন একটি সিকিউলার দল এবং ইসলামী দলের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি ইসলামী দলকে এসব কিছুর বহু উর্ধ্বে থাকতে হবে। নতুবা বিরাজমান বিষাক্ত পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করলে চিন্তা ও কর্মে বৈষম্য বৈসাদৃশ্য দেখা দিবে এবং তা ক্রমশ একটি আদর্শবাদী ইসলামী দলের বিকৃতি ও ভাংগনের পথ সুগম করবে। এজন্য

ইসলাম ও জাহেলিয়াত সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে।

আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নারী স্বাধীনতার দাবী পূরণ করতে গিয়ে তা করা হয়েছে। এর ফলে নারী কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করলেও নারীত্বের মর্যাদা বিনষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃতিগত ভাবে নারীর নিজস্ব দায়িত্ব পালনের পর অতিরিক্ত পুরুষের দায়িত্বের বোঝা সে কাঁধে নিয়েছে। উপরন্তু তাকে পুরুষের ভোগ বিলাসের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। সমাজের নৈতিক পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে। নারী পুরুষের অবাধ মিলনের পূর্ণ সুযোগ করে দিয়ে ব্যভিচারকে অপরাধ নয়, বরং চিত্তবিনোদন মনে করা হয়েছে। বিবাহকে একটা হীন প্রাচীন প্রথা, দাম্পত্য দায়িত্ব পালনকে একটা অসহনীয় বন্ধন, সন্তান জন্মদান ও বংশবৃদ্ধিকে মূঢ়তা, স্বামীর আনুগত্য এক প্রকার দাসত্ব, স্ত্রী হওয়াকে একটা বিপদ এবং প্রেমিক প্রেমিকা সাজা একটা কাল্পনিক স্বর্গ মনে করা হয়েছে।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিষময় পরিনাম বিশ্বের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে পারিবারিক ব্যবস্থা ও মানসিক শান্তি বিনষ্ট করা হয়েছে। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার আকর্ষণীয় শ্লোগান মুসলমানদেরকেও প্রভাবিত করছে।

পরিতাপের বিষয় ইসলামী দল নামে পরিচিত, মুসলিম বিশ্বের কোন কোন সংগঠন সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব পালন জরুরী মনে করে এবং তা করতে গিয়ে ইসলামী নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করছে। যেমন নারী পুরুষের মিশ্র সমাবেশ, অফিস সেক্রেটারী যুবতী, রিসিপশনে যুবতী সাক্ষাৎকালে নারী পুরুষে হ্যান্ডশেক প্রভৃতি।

তাদের চিন্তা চেতনা জড়বাদী চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী আন্দোলন জাহিলিয়াত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বস্তু নয়।

সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন নারী পুরুষের মিশ্র সমাবেশ অথবা উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক হওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা যদি কখনো হয় তা হলে তাকে ইসলামী আন্দোলন বলা যাবেনা। এবং তার দ্বারা ইসলামী বিপ্লব কখনো সম্ভব হবে না। এ সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ সচেতন থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই একে অপরের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণবোধ আছে। যার ফলে পরস্পর কাছে পেতে এবং মিলিত হতে চায়। এ মিলন একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে। বিবাহ ব্যতীত একত্রে মিলন বহু অনাচার, পাপাচার সমাজকে জর্জরিত করছে। এ অনাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হতে হবে। মিশ্র সমাবেশ পরিহার করতে হবে। নতুবা পাশ্চাত্যের নারী সমাজের অতি আধুনিকতার অনুকরণ করতে গিয়ে ইসলামের মৌল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

ইসলামী আন্দোলন তার স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকবে। আন্দোলনকারীদের মন-মস্তিষ্ক ও স্বভাব-চরিত্র যখন পরিপূর্ণ ইসলামী হবে এবং তাদের প্রতি এ দৃঢ় আস্থা পোষণ করা যাবে যে, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হলে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করবেনা, দ্বীনের খেদমতের সাথে নিজেদেরও খেদমত করা শুরু করবেনা, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। তার পূর্বে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

আল্লাহ্ কারো নেক আমল বিনষ্ট হতে দেন না। দেশ পরিচালনার যোগ্যতা ও গুণাবলী অর্জন করলে আল্লাহ্ তখন তাদের উপর সে দায়িত্ব অর্পন করতে বিলম্ব করেন না।

২১। নেতৃত্বের দুর্বলতা

একটি দলের বিকৃতি ও পতনের আর একটি প্রধান কারণ নেতৃত্বের দুর্বলতা। দুর্বল নেতৃত্ব একটি দলকে তার সঠিক মানের উপর স্থিতিশীল রাখতে পারেনা। এ দুর্বলতা কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন ইসলামী জ্ঞান ও নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা, সকলকে নিয়ে কাজ করার যোগ্যতার অভাব, যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা। অর্থাৎ এক কথায় নেতৃত্বদানের জন্য যে সব গুণাবলীর একান্ত প্রয়োজন, তার অভাব হলে দল সঠিক পথে চলতে পারেনা।

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব কয়েক স্তরে বিভক্ত। কেন্দ্র, জেলা, পৌরসভা, থানা

ও ইউনিয়ন। প্রত্যেক স্তরে, সে স্তরের মান অনুযায়ী নেতৃত্ব হতে হবে। সকল স্তরের নেতৃত্ব উন্নতমানের হলে, দলের মানও উন্নত হবে।

নেতৃত্বের প্রধানতম গুণ হচ্ছে সকলকে সমান চোখে দেখা, সকলের প্রতি সমানভাবে ইনসাফ করা। কাউকে আপন এবং কাউকে পর মনে করা নয়। কাউকে বেশী আস্থাভাজন কাউকে কম মনে করে তদানুযায়ী আচরণ করা নেতৃত্বের কাজ নয়।

মরহুম সাইয়েদ মওদূদীর সাথে বহুবার একান্তে দেখা করেছি। প্রতিবার তাঁর আচরণে মনে হয়েছে যে তিনি আমাকে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। যে ব্যক্তিই এভাবে একান্তে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেছেন তিনিও এরকমই মনে করেছেন। এ ছিল তাঁর মহান নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। নেতৃত্ব এ ধরণেরই হওয়া উচিত যেন কেউ তার আচরণে নাখোশ না হয়।

জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহ্য এই যে, সংগঠনের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কারো মধ্যে নৈতিক, আদর্শিক ও সাংগঠনিক বিকৃতি দেখা দিলে তাকে প্রথমত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধনের সুযোগ দেয়া এবং সংশোধন না হলে তাকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করা হয়। ব্যক্তি ও নেতা পর্যায়ে একই রকম পদক্ষেপ। দলকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা এ এক সর্বোৎকৃষ্ট পদক্ষেপ।

আসলে ব্যক্তি সমষ্টি নিয়েই একটি দল হয়। ব্যক্তি ভালো হলেই দল ভালো হয় এবং ব্যক্তি মন্দ হলেই দল মন্দ হয়। সে জন্য একটি দলের ব্যক্তিগঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবেই আপন কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। অতএব একটি দলের ব্যক্তিবর্গ বিকৃতি থেকে বেঁচে থাকতে পারলে দলটিও বিকৃতি ও পতন থেকে রক্ষা পাবে।

ভালোভাবে যাচাই না করে, কাঙ্খিত মানের চরিত্র তৈরি হয়নি এমন কোন ব্যক্তিকে দলে সদস্য করে নিলে অথবা ফেৎনা সৃষ্টিকারী মহলের কেউ দৃশ্যত ভালো মানুষ সেজে জামায়াতে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পেলে, তারা জামায়াতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। তাই এ ব্যাপারে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এমন ব্যক্তির চরিত্র গঠনের জন্য নিম্নোক্ত পন্থায় চেষ্টা করা উচিত।

(ক) কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ও তদানুযায়ী চরিত্র গঠন। এর সাথে সীরাতুন্নবী ও সীরাতে সাহাবাও অধ্যয়ন করা উচিত। তাফহীমুল কুরআন অবশ্যই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হতে হবে।

(খ) প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণ ও ভয় এবং আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি।

(গ) ইবলিস শয়তান ও নফস শয়তানের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রামরত থাকা এবং কাতরকণ্ঠে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হওয়া।

শুধু নিজের চেষ্টায় খোদার পথে চলা সম্ভব নয়। তাঁর পথে চলতে হলে তাঁর সাহায্য ব্যতিত চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেজন্যে কাতর কণ্ঠে তাঁর দয়ার ভিখারী হতে হবে। প্রতি মুহূর্তে খোদার ভয়, তাঁর স্মরণ এবং আখেরাতে জবাবদিহির ভিত্তিতে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত হওয়ার জন্য নামায অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পন্থা আর কিছু নেই। নামায খোদার দরবারে বান্দাহর অশ্রু কাতর একটি দোয়াও। এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২২। নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা আন্দোলনের পতন ডেকে আনে।

জনশক্তির স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে দলের নেতা নির্বাচিত হয় এবং এটাই সঠিক পন্থা। প্রত্যেকে নিঃস্বার্থভাবে তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে যাকে সকলের চেয়ে সবদিক দিয়ে নেতৃত্বের গুণাবলীতে ভূষিত দেখতে পায়, তার স্বপক্ষে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তার রায় দেবে। সর্বাধিক রায় যাঁর স্বপক্ষে হবে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর কেউ তাঁর বিপক্ষে রায় দিয়ে থাকলেও ইসলামী নীতি অনুযায়ী তাঁকেই নেতা বলে মেনে নিতে হবে। তা না করে কেউ যদি তার সমর্থিত ব্যক্তির জন্য গোপন তৎপরতা চালায় তাহলে আন্দোলনের সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতাই করা হয়। আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তার আর কোন অধিকার থাকেনা। এমন ব্যক্তিকে যদি প্রমাণসহ খুঁজে বের করা যায় তাহলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ধরণের লোকের দ্বারা দলের মধ্যে দল সৃষ্টি করা হয় এবং দলে ভাঙ্গন ধরানো হয়। এ ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এ ধরনের মানসিকতা অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারলে জামায়াতের পতন ঠেকানো যাবেনা।

২৩। সমস্যার ত্বরিত ও সঠিক সমাধান।

দলের বিকৃতি ও পতনের আর একটি কারণ হলো সংগঠনের মধ্যে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাধান না করা। যেমন কর্মীদের মধ্যে কারো অন্যায় আচরণের কারণে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে এবং তার ফলে পরস্পর বিরোধী দু'টি দলে জামায়াত বিভক্ত হলে, অতি সত্বর তার সমাধান করা দরকার।

প্রয়োজনে দু'তিন জনের একটি টীম ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা দরকার। উভয় পক্ষকে স্বাধীনভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করতে দিতে হবে। তদন্তকারী দলের বা দলের নেতার আচরণ পুলিশ কর্মকর্তাদের মতো কখনোই হওয়া উচিত নয়। তারা ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে সত্যকে চাপিয়ে রাখতে চান। কিন্তু একটি ইসলামী দলের উচিত প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা। তারপর পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে ইনসাফপূর্ণ সমাধান করতে হবে। কোন পুলিশ কর্তকর্তা অথবা সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে বিভাগীয় তদন্তে তাকে অনেক সময় নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। একটি ইসলামী দলে এমনটি কিছুতেই উচিত নয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ –

হে ঈমানদারগণ! সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হও ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও।' (আল মায়েদাহ ঃ ৮)

পরিপূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নবীগণের আগমন ও ইসলামের আবির্ভাব। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কোন ব্যক্তি যতোই যোগ্যতাসম্পন্ন হোকনা কেন, তিনি যদি ইসলামের মূলনীতি ভঙ্গ করেন দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তাহলে তাকে ক্ষমা করলে অথবা বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে রাখলে, এক সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং দলের বৃহত্তর ক্ষতি হতে পারে। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করে তা জিইয়ে রাখলে দলের বিকৃতি ও পতন হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। আর একটি কথা, ন্যায় সঙ্গত সমালোচনা যিনি বরদাশত করতে পারেন না, তার দ্বারা ইনসাফ কায়েম হবে এ আশা করা যায় না। তাই অসীম ধৈর্য, সহনশীলতা ও খোদাভীরুতার সাথে এ সব সমস্যার মুকাবিলা করতে হবে।

২৪। ত্যাগ ও কুরবানী

ত্যাগ ও কুরবানী ব্যতীত কখনো কোন বিপ্লব হয়েছে ইতিহাসে এর কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমেই বিপ্লবের জন্য কাঙ্খিত চরিত্র তৈরি হয়। ঈমান আনার পর সে ব্যক্তিকে আল্লাহ বিভিন্নভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন এবং এ পরীক্ষার দ্বারা তার ঈমান সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এ পরীক্ষায় জান ও মালের অশেষ কুরবানীর প্রয়োজন হয়। দুনিয়া প্রীতি, দুনিয়া পরস্তি পরিত্যাগ করে ত্যাগ ও কুরবানী স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে না পারলে তার মধ্যে ইসলামের বিপ্লবী চরিত্র কখনোই তৈরী হতে পারে না।

প্রাথমিক পর্যায়ে ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার পরও কোন এক সময় দুনিয়া প্রীতি তার উপর প্রভাব বিস্তার করে আন্দোলন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। এর থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যে দোয়া তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছো তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিয়োনা, তোমার দয়ার ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত কর। কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই। হে আমাদের রব! অবশ্যই তুমি সমগ্র মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তুমি কখনো ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হইওনা।” (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮)

আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য যদি আন্দোলনের পার্শ্ব সংগঠন হিসেবে কোন সংঘ, সমিতি এনজিও অথবা এ ধরনের কোন কিছু তৈরী করা হয়, তাহলে এর দ্বারা বস্তুবাদী মানসিকতা সৃষ্টি হবে। অর্থের প্রলোভনে দলে দলে মানুষ এ সবে যোগদান করবে। তদের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা সৃষ্টি হবেনা। এসব সংগঠন আন্দোলনের সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকর হবে। তা অবশেষে আন্দোলনের পতন ডেকে আনবে।

আন্দোলনকে অর্থকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাব অতীতে কয়েকবার কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করতে হবে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণাসহ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য নয়। অনেক ব্যবসায়ী আন্দোলনে যোগ দান করার পর তাদের ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। এসব তাঁরা হাসিমুখে বরণ করে আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাদের পক্ষেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

হালাল পন্থায় ব্যবসা বাণিজ্য অবশ্যই করতে হবে যাদের তা করার সামর্থ আছে। কিন্তু আন্দোলনে শরীক হওয়ার পর তাকে কাঙ্খিত আর্থিক কুরবানী ও সময় দান করতে হবে। আন্দোলনের স্বার্থকে ব্যবসার স্বার্থের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কেউ দুনিয়ার ধন-দৌলত ও সুখ শান্তি চাইলে আল্লাহ তাকে তা কিছু পরিমাণে দেন। কিন্তু আখেরাতে তার পাওনা কিছুই থাকে না। আর যারা আখেরাতের সুখী জীবন কামনা করে, আল্লাহ তাদেরকে তা দেন এবং দুনিয়াতেও কিছু পরিমাণে দেন। যারা ইখলাসের সাথে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করতে চান, তাদের ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে জীবনের সঠিক লক্ষ্য স্থির করা উচিত।

আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত দুচারজন মিলে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করাতে কোন দোষ নেই, যদি তারা নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করেন, জামায়াতের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি মেনে চলেন। সেই সাথে আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ ব্যয়ও করতে থাকেন। কিন্তু তারা যদি উদারতা ও ক্ষমাশীলতার মনোভাব পরিহার করে কর্মচারীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেন, সাধ্যের অতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন, তাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ না করেন, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। লোক ইসলামী আন্দোলন থেকে সরে পড়বে।

এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হবে যে, তারা দুনিয়ার সামান্য ব্যবস্থাপনা চালাবার যোগ্যতাই রাখেন না। এমন লোক একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন কিভাবে?

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, আমরা প্রকৃত পক্ষে এমন একটা দল তৈরি করতে চাই যার সদস্যগণ একদিকে দীনদারি পরহেজগারিতে পারিভাষিক দীনদার,

মুত্তাকী থেকে হবে অধিকতর অগ্রসর এবং অপরদিকে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চালাবার জন্য সাধারণ দুনিয়াদার থেকে হবে অধিকতর যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন।"

২৫। বাইতুলমাল সম্পর্কে আমানতদারীর অভাব এবং আর্থিক লেনদেনে সততার অভাব।

নবী আকরাম (সঃ) আমানতদারীর অভাবকে ঈমানের অভাব বলে ঘোষণা করেছেন। আমানত খেয়ানত সেই করতে পারে যে পার্থিব স্বার্থকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। একটি ইসলামী সংগঠনের বাইতুল মাল যার দায়িত্বে থাকে তার পূর্ণ আমানতদার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এদিক দিয়ে পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হতে হবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ কেউ বাইতুল মাল তসরুফ করলে সে তার নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং ইসলামী সংগঠনে থাকার অধিকারও হারিয়ে ফেলে।

জামায়াত গঠনের পর রুকনগণের উদ্দেশ্যে মাওলানা প্রথম ভাষণে এ কথাও বলেন যে, সর্বদা বাইতুল মালের তদারকী করতে হবে। তদারকীর অভাবে তা তসরুফ করার আশঙ্কা থাকে। এ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীতে কড়াকড়ি থাকলেও তা অনেক সময় মেনে চলা হয় না।

বাইতুল মাল থেকে কিছু আত্মসাৎ এমন এক অপরাধ যার কঠোর শাস্তি আখিরাতে দেয়া হবে বলে হাদীসে বর্ণিত আছে–

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, (খায়বর যুদ্ধের ঘটনা, মুসলমান বিজয়ী এবং শত্রুর ময়দান ছেড়ে পলায়ন) সাহাবীগণের কয়েকজনসহ নবী (স.) ময়দান ঘুরে ফিরে দেখছেন। তাঁরা নবীকে (স.) বলেছেন, অমুক শহীদ অমুক শহীদ। তাঁরা সামনে অগ্রসর হওয়ার পর এক মৃত ব্যক্তিকে দেখলেন। তাঁরা বললেন অমুখ ব্যক্তি শহীদ। নবী (স.) বললেন, না, কখনো না। তাকে ত আমি জাহান্নামে দেখতে পেলাম। কারণ সে একটা চাদর বা কোর্তা চুরি করেছিল।

অতঃপর নবী (স.) বলেন, হে ইবনে ওমর! যাও এবং লোকের মধ্যে ঘোষণা করে দাও মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (ইবনে ওমর

রা.) বলেন, তারপর আমি বের হয়ে এ ঘোষণা করলাম যে, মুমিন ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

এর থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলন করতে গিয়ে আমানত খেয়ানত করে আমরা যেন জাহান্নামের পথ বেছে না নিই। এক ব্যক্তি আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবন দিয়েও জান্নাত লাভ করতে পারলেন না। কারণ তিনি মালে গনিমত বা আমানত খেয়ানত করেছিলেন। আমরা যদি খোদানাখাস্তা আমানত খেয়ানত করি তারপর এ কারণে কি নাজাত পাব যে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম?

আমানত খেয়ানত লেনদেনে অস্বচ্ছতা, অবৈধ উপায়ে ধন সম্পদ অর্জনের মোহ ইসলামী আন্দোলনের পতনের কারণ হয়ে পড়ে। এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আন্দোলনের সুস্থতার জন্য একান্ত জরুরী।

দাওয়াত ও তবলিগ এবং তরবিয়তি নিজাম

একটি ইসলামী দলের সর্বপ্রথম কাজই হচ্ছে মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত পরিবেশন করা। পেশ করতে হবে বুদ্ধিমত্তাসহ হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। আল্লাহর সকল নবী এ কাজ আনজাম দিয়েছেন।

দাওয়াতী কাজের দুটি সুফল যদি তা সঠিকভাবে করা যায়।

এক. সঠিক দাওয়াত দানের মাধ্যমে যতো বেশী লোককে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, তাতোবেশী ইসলামের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি হবে। ইসলামী বিপ্লবের জন্য জনমত সৃষ্টি অপরিহার্য।

দুই. যিনি দাওয়াত পেশ করবেন, তাকে অবশ্যই ইসলামের মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়। ফলে তার পক্ষে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

একটি ইসলামী দলের দাওয়াতী কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তা একটা প্রাণহীন ও অর্থহীন সংগঠনে পরিণত হয়। দলের প্রতিটি ব্যক্তি নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করছেন কি না তার ভালোভাবে তদারকি হওয়া দরকার।

তরবিয়তি নিজাম

দাওয়াত দাতার মধ্যে যেসব যোগ্যতা ও গুণাবলীর প্রয়োজন, তা অর্জন করার জন্য তরবিয়তি নিজাম বা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে তা আছে। তা ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা উচিত।

মাওলানা মওদূদী বিভিন্ন সময়ে কর্মী ও রুকনদের বিভিন্ন সমাবেশে তরবিয়ত ও তাযকিয়া সম্পর্কে যে মূল্যবান ভাষণ দিয়েছেন তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

মাওলানা কর্মীদের জন্য এটা অতি আবশ্যক বলে গণ্য করেন যে, তাদেরকে প্রথমতঃ চারটি গুণের অধিকারী হতে হবে।

১। ইসলামের সঠিক উপলব্ধি,

২। ইসলামের উপর পাকাপোক্ত ঈমান,

৩। কথা ও কাজের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য,

৪। দীনকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ।

কর্মীদের মধ্যে সামাজিকভাবে যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন তা হলো ঃ

১। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা,

২। পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা,

৩। নিয়ম-শৃঙ্খলা পুরোপুরি মেনে চলা,

৪। সংশোধনের নিয়তে সমালোচনা করা।

পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী যা সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ

১। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

২। আখিরাতের জবাবদিহিকে স্মরণ রাখা ।

৩। চরিত্র মাধুর্য ।

৪। ধৈর্য।

৫। প্রজ্ঞা।

তরবিয়াত ও তাযকিয়া বিষয়ক নিম্নলিখিত সাহিত্যগুলো কর্মীদের অধ্যয়ন করা উচিত ঃ

১। তাহরিক আওর কারকুন- মাওলানা মওদূদী।

২। ইন্তেখাব ও তারতীব- মাওঃ খলিল আহমদ হামিদী।

(এ গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে মাওলানা মওদূদীর প্রদত্ত ভাষণের সংকলন)

৩। তা'মীর সীরাত কে লাওয়াযেম- নঈম সিদ্দিকী

৪। তাযকিয়ায়ে নফ্স - মাওঃ আমীন আহ্সান ইসলাহী।

৫। ইসলাম আপসে কিয়া চাহতা হ্যায়- সাইয়েদ হামেদ আলী

৬। আপনি ইসলাহ্ আপ - নঈম সিদ্দিকী

৭। ইসলাম এক নিযামি তরবিয়াত - মাওঃ ইনআমুর রহ্মান খান।

৮। তাহরিকে ইসলামী মে- খুররম মুরাদ।

৯। বাহামী তায়াল্লুকাত - খুররম মুরাদ।

প্রথম ও অষ্টম বইখানির বাংলা অনুবাদ হয়েছে। বাকীগুলোও কর্মীদের পাঠ্য তালিকায় থাকা উচিত। অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরগুলোতে কর্মীদের মধ্যে এ সবের বাস্তব প্রতিফলনের অনুশীলন হওয়া উচিত।

অত্র প্রবন্ধে যা কিছু বলা হলো ঃ তা একটি আদর্শবাদী ইসলামী আন্দোলনকে তার সম্ভাব্য বিকৃতি ও পতন থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু পরামর্শ। অতীতে যে সব কারণে এ ধরণের দলের পতন হয়েছে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এ পরামর্শ পেশ করা হয়েছে। পতনের অন্যতম কারণ হলো নিয়মিত দীনি সাহিত্য পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাফহীমুল কুরআন, সীরাতে সরওয়ারে আলম, রাসায়েল ও মাসায়েল এবং মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যাবলী পাঠের অভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়, জনশক্তির মধ্যে ঐক্যের অভাব ঘটে, নৈরাশ্য, অবসাদ, ক্লান্তি, আন্দোলন বিমুখতা ও নিষ্ক্রিয়তা এসে যায়। পড়াশুনা বন্ধ হলেই এমনটি হয়ে থাকে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনে শরীক সকলকে সিরাতুল মুস্তাকীমে অটল থেকে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের তওফীক আল্লাহ তায়ালা দান করুন, আমীন।

প্রকাশনী বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ